দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 NOV 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার জন্য

অলকা ঘোষ

বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে দু'টি ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। একটি সরকারী, অন্যটি বেসরকারী। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থার ফলে উভয়ের মধ্যে বিরাট বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী কম খরচে যেমন পড়াশোনার সুযোগসহ নানা সুবিধা পায়, তেমনি সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীও সামাজিক-নৈতিক সুবিধার মাধ্যমে ভবিষ্যতের নিশ্চিত জীবনের নিশ্চুতি লাভ করে।

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা অনেকক্ষেত্রে অতীতভাবেই শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে। এই স্তরে শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবন মোটেই সুখের নয়।

বেসরকারী শিক্ষকরাই দেশের ৯০ ভাগ শিক্ষা কার্যের ভার পালন করেন।

একই পাঠ্যসূচী অনুসারে উভয়ক্ষেত্রে পাঠদান করা হয়। একই শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা গ্রহণ, একই মানসম্পন্ন সার্টিফিকেট উভয়বিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা লাভ করে। অথচ একই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬৫ বছর চাকরির সীমা বৃদ্ধি করা (কতিপয় ক্ষেত্রে) এবং ৭০ বছরে তা উন্নীত করার দাবি উত্থাপন করার কথা উল্লেখ করা যায়। বলা হচ্ছে, দেশে ইংরেজী শিক্ষকের অভাব। ইংরেজী শিক্ষক, যাঁরা বিষয়ভিত্তিক ক্লাস করেন, তাঁরা পূর্ণবেতনে ৬৫ বছর কাজ করতে পারবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অনেকেই এই বয়সটা ৭০ পার করে যাবজ্জীবন থাকার কথা কামনা করেন। শোনা যাচ্ছে, দেশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকের পরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে আগ্রহী নয়। ফলে, অদূরভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব দেখা দেবে।

যে দেশের বিপুল সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণী নিজেদের মেধা ও মননের অপচয় ঘটিয়ে বেকারত্বের দুঃসহ যন্ত্রণায় মানবেতর জীবনযাপন করছে, সে ক্ষেত্রে চাকরি সময়সীমা বৃদ্ধির দাবিটা হাস্যকর। এটা সাধারণ শিক্ষকদের প্রাণের দাবি নয়। তাছাড়া কেউ ষাটের পরে কাজ করার সুযোগ পেলেও ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে বঞ্চিতও করা হচ্ছে। ষাটোর্ধ ব্যক্তির চাকরির প্রয়োজন নেই। তাঁর আর্থিক নিশ্চিত অবসর জীবন চাই। যদি তাঁর নাবালক শিশু-পুত্র-কন্যা থেকে থাকে তা হলে পুত্র-কন্যার শিক্ষার ব্যয়ভার বা অবৈতনিক শিক্ষার দাবি উঠতে পারে। আমাদের অনেকেরই পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্রছাত্রী শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের পর শুধুমাত্র একটা চাকরি লাভের প্রত্যাশায় প্রহর গুণছে। তাদের কর্মজীবনে পদার্পণের মাধ্যমেই নতুন পরিবার গঠন ও পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে পারে তারা। সামগ্রিক স্বার্থে এবং সরকারী-বেসরকারী বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যেই তাই চাকরির মেয়াদ সর্বোচ্চ পঁয়ষট্টি হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তার বেশি নয়। আর সেই সাথে অবসরকালীন সুবিধাপ্রাপ্তির সহজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। বিভেদনীতি নয়, সবার জন্য প্রযোজ্য এবং কল্যাণকর একটিমাত্র চাকরিবিধিই সাধারণ শিক্ষকদের কাম্য। যদি এর মধ্যেও কোন শিক্ষক সুস্থ ও কর্মঠ থাকেন, তাঁদের মেধা ও শ্রম শিক্ষাবিষয়ক গবেষণাকর্ম-প্রকাশনা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় গঠনমূলক কোন কাজেই নিয়োজিত করার ব্যবস্থা রাখা যায়। তা না হলে আজ যাঁরা বিশেষ সুবিধা লাভে খুব পেয়েছি বলে মুখ বন্ধ করে বসে থাকবেন, পরবর্তী সময়ে অন্যরা তা পাইনি বলে "দাও দাও" দাবিতে সোচ্চার হবেন। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের খুশি-না খুশির দৌরাত্ম্য বেড়ে যাবে বহু গুণ এবং কৃপাভাজন ব্যক্তিরা রাতারাতি ইংরেজী শিক্ষক বনে যাবেন।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বর্তমানে সরকারী তহবিল থেকে ৮০ ভাগ যাচ্ছে—যাচ্ছে আরও অনুদান, মঞ্জুরী। যদি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবেতন ইত্যাদি আয় সরকারী তহবিলে জমা হয়, তা হলে বিশেষ ঘাটতি থাকে না। ৬৫/৭০-এর বিভেদনীতি দূরে থাক, সরকারী বিধিমালা মোতাবেক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে যেন নিয়োগ লাভ করতে পারেন, সে ব্যবস্থার সাথে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও পূর্ণ অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মিগণ যুগ যুগ ধরে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়ে আসছেন।

সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যসমূহ দূর করার জন্য দেশের শিক্ষকসমাজ সোচ্চার। নিজেদের বাঁচার দাবিতে বিভিন্ন সময়ে তাঁরা সংগঠিত হয়ে মিছিল-মিটিং-সেমিনার করেছেন। ধর্মঘট করেছেন। মহাসমাবেশ করে অনশন পর্যন্ত করেছেন। আন্দোলনের মাধ্যমেই তাঁরা বর্তমানে কিছুটা সম্মানজনক অবস্থানে আসতে পেরেছেন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছেন না।

শিক্ষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁদের সংগঠন রয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও মতদ্বৈধতা, নেতৃত্বের বাসনা, খ্যাতি ও ক্ষমতার মোহে বিভক্তি দেখা দেয়। আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজশক্তি সব সময়ই একটি দলকে আয়ত্তে এনে বিভেদনীতি চালিয়ে আসছে। যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকুক না কেন, শিক্ষকদের আন্দোলনের চাপের মুখে কোন কোন দাবি মেনে নিলেও বিধাবিভক্ত কোন না কোন সংগঠন ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য সাধারণ শিক্ষকদের দাবিকে পাশ কাটিয়ে যায়। সামগ্রিক স্বার্থ, বৃহত্তর কল্যাণের বাসনা বিসর্জন দেবার ঘটনা ঘটছে এভাবেই।

যে কোন সংগঠনের নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সুবিধা গ্রহণের ব্যাপারটা প্রধান্য লাভ করলে সর্বজনীন দাবি স্তব্ধ হয়ে যাবারই কথা। পরিস্থিতি সাময়িকভাবে শান্ত করা গেলেও যাঁদেরকে সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিরা উপরে উঠলেন, তাঁদের প্রাণের দাবিকে কুঠারাঘাত করে নিজের মঙ্গল হবে কি? বরং সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য দূর করার মূল দাবিকে অবহেলা করে এভাবে উভয়ক্ষেত্রের বৈষম্য প্রকট করে তোলা হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ সরকারী চাকরিবিধির বয়সসীমা লঙ্ঘন করে